মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গের কাল, মূলধারার বাংলা উপন্যাস ১৯৬৫-৮০

শম্পা চৌধুরী

হৃদয় জুড়িয়া সত্তা ভরিয়া এক হাহাকারবোধ সর্বদা মাথা কুটিতেছে। সরল, সাহসী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অবিরত তাহার স্বপ্নের র ূপরেখা আঁকিয়া যাইতেছে। ভাবিতেছে বিদেশি শক্তি উত্যক্ত হইয়া নিঃশর্ত স্বরাজ দিতে বাধ্য হইবে। ভাবিতেছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার গঠিত হইবে, তাহার মূল লক্ষ্য হইবে ক্ষুধার অন্ন, শুভবুদ্ধির জন্য শিক্ষা, সামগ্রিক উৎকর্ষের জন্য স্বাস্থ্য। ভাবিতেছে কঠোর উদাহরণমূলক শাস্তি দিয়া যাবতীয় সুযোগসন্ধানী, জুয়াচোর, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিপথগামীগুলিকে বুঝাইতে হইবে এরূপে চলিবে না, চলিবে না। কিন্তু রাজনীতির কুটিল হাত, স্বার্থান্বেষীর ক্লিন্ন অঙ্গুলি সকল ব্লু - প্রিন্টই মুছিয়াদেয়। এই বাস্তবকে চোখের স ম্মুখে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না দুর্গাপ্রসাদ। মানিয়া লইতে পারেননা। মনে হয় এ বুঝি এক কালস্বপ্ন।

বাণী বসু-র সাম্প্রতিক উপন্যাস 'অষ্টম গর্ভ'-র একটি অন্যতম প্রধান চরিত্র এই দুর্গাপ্রসাদ, যাঁর '...দল নাই। সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখনও সঙ্কল্প আছে। বিবেক আছে।' পেশায় ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও নিয়মিত শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়ে উদ্বাস্তু মানুষের চিকিৎসা ও সেবা করেন। এই নিঃস্বার্থ পরোপকারে তাঁর হৃদয়ের মধ্যেকার বৃহৎ আমিটি হয়তোসামান্য তৃপ্তি পায় কিন্তু এই আত্মতৃপ্তি তাঁর স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে ভুলিয়ে দিতে পারে না। বারবার মনে হয় 'গোটা দেশটারই একটা উদ্বাস্তু কলোনি হয়ে যাওয়া কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এই অদ্ভুত বেআক্কিলে স্বাধীনতার ফলে দেশখানা... অতিরিক্ত মানুষের ভারে টলমল করছে...। ... সব ছারখার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সমাজ সংস্কৃতি বলে আর কিছু থাকবে না। এতদিনের লালিত ভ্যালুজ সব পাল্টে য াবে। একটা মাতাল, করাপ্ট, ভায়োলেন্ট সোসাইটি তৈরি হবে।' কিন্তু এ ভাবনা নিছক কোনো একজন দুর্গাপ্রসাদের নয় এর সঙ্গে আমরা অনায়াসেই মিলিয়ে নিতে পারি স্বাধীনতার সমকালে অগণিত সাধারণ বিবেকবান মানুষের সার্বিক স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত 'দ্য গ্রেট ইণ্ডিয়ান মিডলক্লাস' গ্রন্থের রচয়িতা পবনকুমার ভর্মা স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসগঠনের যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেছেন সেগুলি হল

১। সমাজ ও জনজীবনে নৈতিকতার স্বীকৃতি এবং রাজনীতিতে আদর্শবাদের প্রতি আস্থা।

২। যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ও শিল্পোন্নত এক ভবিষ্যৎ ভারতের কল্পনা

৩। দরিদ্র এবং দুর্বলতর শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা

৪। বৈভবের বিজ্ঞাপনের প্রতি আন্তরিক কুণ্ঠা

৫। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন

স্বাধীনতার লগ্নে পশ্চিবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য কমবেশি নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে চল্লিশের দশক থেকেই বাঙলাদেশ তথা বাঙালির অভিজ্ঞতা ভারত র্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। এই পর্বে বাঙলা দেখেছে ভয়াবহ মন্বন্তর. সুভাষের অভিযান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অবশ্যই দেশভাগ যার প্রত্যক্ষ ফলও ভোগ করতে হয়েছে তাকেই। ১৯৫০ স ালের ২৭ জুলাই পর্যন্ত ৬১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৯৭ জন উদ্বাস্তু পূর্বপাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন এবং অগস্ট মাসের ভেতরেই কাঁচড়াপাড়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠেছে। এরপর প্রায় গোটা দশক জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ব াস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে একের পর এক খাদ্যসঙ্কট। শিপ্রা সরকার তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ষাটের দশকের গোড়ায় নিম্ন, মধ্য আর উচ্চ আয়ের মানুষের গড়ে মাসিক উপার্জন ছিল যথাক্রমে ৬০ ট াকা থেকে ৩৫০ টাকা, ৩৫১ থেকে ৭০০ টাকা এবং ৭০০ টাকার বেশি। এই পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায় চ ালের দাম ১০০ টাকা মণ হলে বা মাছের দর ৪ টাকা সের হলে সাধারণ মানুষের কেন মনে হয় বাজারদর আকাশ ছোঁওয়া হয়ে

উঠেছে। পাশাপাশি ১৯৬১ -র জনগণনায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ১০ বছরেবৃদ্ধি পেয়েছে ৩২.৭৯ শতাংশ যা সর্বভারতীয় হারের চেয়ে ১১ শতাংশ বেশি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, খাদ্যে ঘাটতি, ভূমি সংস্কারের দুর্বলতা, বাম রাজনীতির ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ছাত্র বিক্ষোভ, অসমে বাঙালি বিরোধী দাঙ্গা এবং সর্বোপরি চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সমস্ত মিলিয়ে ষাটের দশকের প্রথম কয়েকবছর এক নিতান্তই অস্থির সময় চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যেমন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল তেমনি এই সীমান্ত যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ জনমানসে প্রতিভাত হল বাস্তব অবস্থার চাপে আদর্শবাদের পশ্চাদপসরণ রূপে, রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতি জাগিয়ে তুলল সন্দেহ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মীভূত কংগ্রেসদলের শাসনক্ষমতারপ্রতি তৈরি হল একধরনের অনাস্থাবোধ। এরপর ১৯৬৪ তে নেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকে চলে আসতে থাকা রাজনৈতিক পারম্পর্যের অবসান ঘটল, বদলে গেল মূল্যবোধের কাঠামো। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রিত্বের পর ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে কংগ্রেসে প্রবীন নেতারা যেভাবে এবং যে লক্ষ্যে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে প্রধানমন্ত্রিত্ব তুলে দিলেন এবং ইন্দিরাও যে পদ্ধতিতে কংগ্রেসের তণ তুর্কিদের সহায়তায় নিজেকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন তা থেকে জনমানসে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে রাজনীতিতে আদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধেরদিন অবসিত ; যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল ও ভোগ করাই প্রধান লক্ষ্য। গান্ধীর মত াদর্শে পন্থা এবং অভীষ্ট ছিল সমান গুত্বপূর্ণ, সমনৈতিক কিন্তু ৬০ এর দশকে এসে সেই ভাবধারা সম্পূর্ণ বিসর্জিত হল। পবন ভর্মার ভাষায় ‘ … there was the Glorification of Power as an absolute end in itself: the net outcome of political activity must be the retention and consolidation of power ; if this is achieved, the activity, however base its motivation and content, is sanctified.’
এই সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তে লাগল। ১৯৬৭ - নির্বাচনে পরাজিত হলে কংগ্রেস গঠিত প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার আর সেখান থেকে আরম্ভ করে ১৯৭২ -র নির্বাচন পর্যন্ত একাদিক্রমে চলতে লাগল মন্ত্রিসভার ভাঙাগড়ার খেলা। বিপর্যস্ত হল জনসমাজ, সত্যি হল দুর্গাপ্রসাদের দুঃস্বপ্ন।

বস্তুতপক্ষে স্বাধীনতার মধ্যরাত্রির সন্তানরা মধ্যষাটে এসে যাঁরা পৌঁছে যাবেন কৈশোরের শেষ প্রান্তে বা যৌবনে, মনে রাখতে হবে এই স্বাধীন বঙ্গে তাঁরা বড় হয়ে উঠেছেন এক সার্বিক মোহভঙ্গের কালে। নিঃসন্দেহে তাঁরা এক অসুখী সময়ের সন্তান। তাঁদের অস্থিরতা তথা নৈরাজ্যের সঙ্গে আমরা অনায়াসেই মিলিয়ে নিতে পারি ‘বিবর’- এক কথকনায়কের ভণিতাহীন, নিষ্করুণ, আত্মসমালোচনামূলক, বিদ্রুপাত্মক স্বগতোক্তিকে যা সুবিধাবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণীকে তার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বসমেত নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছে। শিক্ষিত, সুচাকুরে, প্রমোদেমত্ত অজ্ঞাতনামা এই মধ্যবিত্ত যুবকটি মোহমুক্ত যুবসমাজের সার্থক প্রতিনিধি যাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই অথচ এই ঘুণধরা সমাজব্যবস্থায় যারাসর্বতোভাবে পিষ্ট ও অসুখী। প্রচলিত মূল্যবোধের প্রতি এই যুবসমাজের আন্তরিক অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে এই আপাত অশ্লীলতা স্পৃষ্ট স্বগতকথনে। ‘বিবর’-র অজ্ঞাতনামা যুবকটির একমাত্র চেষ্টা ব্যক্তিক ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা তথা ভণ্ডামির পরাধীনতা থেকে সত্যের স্বাধীনতায় উত্তরণ। কিন্তু সত্যান্বেষণের এই পথে সে প্রকৃতপক্ষে নিজেই অচেনা ‘আমি’কে আবিষ্কার করতে করতে এগোয়---

...যা অন্যায় অবিচার ভুল আর মিথ্যা, যা আমাদের জীবনের চারপাশে শিকড় গেড়ে বসে আছে, যে কোন দিকে চোখ তুলে তাকালেই দেখা যায়, এসব মেনে নিয়ে থাকাটাই গর্তের সুখে থাকা। পরাধীনতা যাকে বলে, আর এর বিদ্ধে স্বাধীনতা আমাদের ঠেলে দিতে চায় আমি বলতে চাই, তেড়ে আসে। এবং এই তেড়ে আসাটা নিজেই অনেক জানতে পারি না, যে কারণে বলতে হয়, নিজেকেই বোধহয় ঠিক চিনি না, জানি না।
সমাজেও ব্যক্তিসম্পর্কের অন্তরালে সংঘাটিত অনাচার জন্ম দেয় বিবমিষা ও অসুখের। উপন্যাসের নামহীন চরিত্রটি যখন দুর্নীতি ত্যাগ করে অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে তার সৎ সিদ্ধান্তের কথা জানায় তখন তার বয়স্ক ওপরওয়ালা নানাভাবে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং তার মনোভাবকে ঔদ্ধত্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে ব্যাখ্যা করে দায়ী করে সমস্ত প্রজন্মকেই। আর তখন এই অভিযোগের উত্তরে যুবকটিও মনে মনে বলে, ...আমাদের জন্যে, এই ছোকরাদের জন্যে দেশটা গোল্লায় যাচ্ছে, আর তোমরা এই ঘাগীরা স্বর্গরচনা করছ। দেশের লোকেরা তোমাদের চেনে না। যত দোষ ছোকরাদের পোশাকে - আশাকে আর তোমাদের ভদ্র আর শালীন পোশাকের তলায় সব সাচ্চা, এই ‘ন্যায়ের সুন্দর’ রাজত্বটা তোমরা চালাচ্ছ। আমরা কাদের ছেলে আর তোমরা কাদের বাবা, তা তোমরা জান না। আমরা সব ভুঁইফোড়, মরে যাই।

নীতার খুনের তদন্তকারী গোয়েন্দাটিকে সে সরাসরি প্রশ্ন করে, আচ্ছা বলতে পারেন, আমি, আপনি, আমরা কেন জেলের বাইরে?...আমরা সকলেই বেশ বদমাইশ নয় কি ?...আপনার চাকরিটা তো যাকে বলে সমাজের অপরাধীদের ধরা, কিন্তু সত্যি কি অ

াপনি তা ধরছেন? সে স্বাধীনতা কি আপনাকে দেওয়া হয়েছে? আপনি কি জোর করে বলতে পারেন আপনি কোনও অপরাধ করেননি, যেমন ধন আমি ঘুষ খাই, তেমনি কি বলতে পারেন, আপনি সংবিধান, আইন সব নিত্তিতে মেনে চলছেন ? আমাদের সব কিছু দেখে কি তাই মনে হয় ? এই দেশটাকে দেখে আর এই দেশের মানুষের অবস্থা দেখে? তা যদি না হয়, তাহলে আপনার আমার মত, আমাদের থেকেও বড় বড় মানুষের কি জেলখানা ভরে যাওয়া উচিত নয়?

দুর্নীতির ত্যাগের সিদ্ধান্তের জেরে যুবকটির চাকরি যায় আর তখন তার রাজনীতিকরা এক পুরোনো বন্ধু এসে প্রস্তাব দেয় তাদের দলে যোগ দিয়ে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে কারণ মানুষে, যখন তার পরিচয় জানবে, চাকরি ছাড়ার কথা শুনবে তখন ত াকে লুফে নেবে। আর এটা শুধু সেই বন্ধুটির নয়, দলীয় নেতাদেরও মত। কিন্তু ‘বিবর’-এর কথক নায়ক তিরিশে পৌঁছবার আগেই জেনে গেছে রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ, বুঝে গেছে রাজনীতিও আসলে একটা জেলখানা, যে স্বাধীনতা সে চায় তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী

সবাই গোপালঠাকুর চিনে বসে আছে, যেন আমি জানি না, আমার চাকরির চত্রের মত পার্টিরও চত্র আছে, এবং চাকরির চত্রে যেমন ঘুষ খাওয়া অপরাধ নয় তেমনি পার্টিচত্রের মধ্যেও কোন পাপই পাপ নয়, যদি পার্টির প্রয়োজন হয়, (যেমন ভোটের চুরি, ঘরের বউকে বেশ্যা, বেশ্যাকে ঘরের বউ সাজিয়ে সবাই কাজ সারে, কিংবা যাকে কুকুরের মত ঘৃণা করি, হয়তো ও বেলাই ঠেঙিয়ে মারব, অথচ এ বেলা তার গালে চুমু খেয়ে কথা বলছি, পলেটিকস্ যে।) তারপরে ধাক্কা মেরে একদিন গেটের বাইরে। তোমার পরিচয় ‘ম ানুষ’ নয়, ‘পার্টিম্যান’, তখন যদি তোমার মনে হয়, পার্টির নেতা ভুল করছে বা অন্যায় করছে বা ধর তোমার প্রেমিকাকেই লুটছে, কিংবা একটা আন্দোলনই বানচাল হয়ে যেতে পারে, তবু খবরদার, একটি কথানয়, যন্ত্রের মত, এগিয়ে চল, পোষা কুকুরের মত ‘লয় াল’ হও, কারণ কি না, যত পাপই করি, আখেরেভালর জন্যেই তো ! স্বাধীনতাকে ভয় পায় না, এমন পার্টি আমি কোথাও দেখিনি, আর আমি যে গর্তের বাইরে একটা বন্ধুকে বোঝানো যাকে বলে, একেবারেই দুঃসাধ্য, কারণ আমার চেয়ে জঘন্য স্বাধীনতা ওর কাছে হয়তো কোন অর্থই বহন করবে না। অতএব কাটো , নড়ুই যা হচ্ছেন তা দ্যাশের নোকে দেখছেন।

মধ্যবিত্ত যুব সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি এই অসমসাহসী যুবকের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ত্রমশ সম ার্থক হয়ে যায়। অন্যায্য সমাজব্যবস্থায়, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের গণ্ডিতে আবদ্ধ ব্যক্তিসুখের ‘বিবর’ থেকে নিষ্মণের এই গল্পটি মধ্যবিত্ত যুবসমাজের অকপট সত্যকথনের দলিল হয়ে ওঠে, যার মূল কথা উপন্যাস রচয়িতার হয়তো বা আমাদেরও এক গোপন ইচ্ছা, ‘অ াচ্ছা আমরা যদি সবাই সত্যি কথা বলতে পারতাম।’

‘বিবর’-এর স্বীকারোক্তিমূলক এই থীমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একধরণের অপরাধবোধ আর এই অপরাধবোধ মূলতব্যক্তিসুখের গর্তে বাস করার অনুভূতির থেকে সঞ্জাত। কিন্তু একইসঙ্গে উচ্চাশা, ব্যক্তিস্বার্থে অপরকে ব্যবহার তথা উন্নতির জন্য নৈতিকতা বিসর্জন জনিত অপরাধবোধ ও তৈরি হয়ে যায় আর ষাটের শেষ থেকে সত্তরদশক পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে এই থীমগুলিই নানাভাবে ফিরে আসে। ১৯৬৭-র শেষভাগে প্রকাশিত হয় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর ‘ঘুণপোকা’-উপন্যাসটি। এর নায়ক উচ্চাকাঙক্ষী, সুপুষ, সুচ াকুরে শ্যাম চত্রবর্তী ওপরওয়ালার ‘বাস্টর্ড’ গালগাল সহ্য করতে না পেরে চাকরি ছেড়ে দেয়। নিজের সামাজিক পরিচিতি মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় নিজেকে খোঁজার পথে অগ্রসর হতে হতে সে ত্রমশই পরিণত হয় সমাজবিচ্ছিন্ন এক ধবংসাবশেষে। তার মনে হয় ‘ভবিষ্যৎ চিন্তাই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। অতীতচিন্তাও। ‘বিবর’-এর নামহীন কথক ও ‘ঘুণপোকা-র শ্যাম চত্রবর্তীর বিদ্রোহের পন্থার মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য সহজেই অনুভব করা যায়। তবে পাশাপাশি একথাও হয়তো উল্লেখ করাপ্রয়ে াজন যে নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে অস্তিত্ববাদের মূল প্রশ্নে পৌঁছে গেলেও শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে নেয় বাস্তববিচ্যুত স্বপ্নময় এক ভবিষ্যতের কল্পনায়।

কুয়াশা কেটে গেলেই দেখতে পাবো আমি হঠাৎ এক অচেনা বিদেশে পৌঁছে গেছি, যেখানে খাওয়ার লোকনেই বলে ইলিশের ঝাঁক চলে যাচ্ছে সমুদ্রে, গর বাঁট থেকে খসে পড়ছে দুধ, চাক থেকে মধু চুইয়ে মাটি যাচ্ছে ভিজে, যেখানে সৎ ব্যবসায়ীরা দোকান সা জিয়ে বসে আছে যেখানে সারা দেশে এক দাম, যেখানে শান্ত ধার্মিক মানুষেরা ধীর পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারা বছর যেখানে চলছে উৎসব...।

একই সঙ্গে সে আশা করে ...একদিন খুব সুসময় এসে যাবে। ভালো জমিতে আমরা তুলবো ঘরবাড়ি, তৈরি করবো বাগান, মাছ ছেড়েদেবো পুকুরে, ছাড়া জমিতে বসিয়ে দেবো জ্ঞাতিদের ঘর, একআধজন বোষ্টম, আর ধোপা নাপিত। দূর বিদেশ থেকে আমি তে ামাদের কাছে ফিরে আসবো, আমি নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসবো সুদিন।

কিন্তু এই ইউটোপিয়াকে সার্থক করতে, বাস্তবে রূপায়িত করতে কোনো উদ্যোগ সে নেয় না। তাই সমাজ এবং তার আত্মজিজ্ঞাসা ঘুণপোকার মতোই তার আস্তিত্বকে ধীরে ধীরে ধবংস করে দেয়, তার বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে যায়।
'ঘুণপোকা'র শ্যাম চত্রবর্তী চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়তো একধরনের স্বস্তি পায় কিন্তু শংকর-এর 'সীমাবদ্ধ' (১৯৭০) উপন্যাসের নায়ক শ্যামলেন্দু চাকরি ছাড়ে না, ছাড়তে পারে না। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা শেক্সপীয়র পড়ুয়া শ্যামলেন্দু হিন্দুস্থান পিটার্স-এর অন্যতম ডিরেক্টর হওয়ার উচ্চাশায় অন্যয় জেনেও শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়। কোম্পানির স্বার্থরক্ষায় সংঘটিত এই বিক্ষোভ ও অশান্তির পরিণামে মারা যায় দারোয়ান হীরা সিং। 'বিবর'-এর অজ্ঞাতনামা কথক নায়ক কিংবা 'ঘুণপোকা'-র শ্যাম চত্রবর্তীর মতোই সংবেদনশীল শ্যামলেন্দু বিবেকের নিঃসীম দংশন অনুভব করার মাঝেও বুঝতে পারে যে 'বোতাম টিপে দিলে যন্ত্রের মতো' চলতে থাকা কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য এক্সিকিউটিভের জীবনে বিত্তের প্রাচুর্য থাকলেও প্রকৃত অর্থে তা অতীব সঙ্কীর্ণ, 'লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের দায়িত্বের মতন'ই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সমস্ত বুঝেও শ্যামলেন্দু তার আত্মসুখের বৃত্ত থেকে বেরোতে পারে না, তাকে বেঁচে থাকতে হয় তার কৃত্রিম জীবন নিয়ে, তার সমস্ত গ্লানি ও অপরাধবোধ সঙ্গে করে, আর বল াবাহুল্য এখানেই তার ট্রাজেডি।
মধ্যষাট থেকে আরম্ভ করে সত্তর -এর শেষ পর্যন্ত সময়কালে মধ্যবিত্তের যে মানসগঠন আমরা লক্ষ করি তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হতাশা, ক্ষোভ ও চূড়ান্ত অসহায়তা। দিব্যেন্দু পালিত এর 'আমরা' (১৯৭৩) উপন্যাসের কথক নায়ক প্রিয়নাথ মজুমদার। জীবনের তুচ্ছতা, অসহায়তা, একঘেয়েমি, সমস্ত মিলিয়ে তার মনে হয় '...প্রিয়নাথ মজুমদার বলে সত্যিই কেউ নেই, আসলে সে আর ল্যাম্পপোস্ট অ ার ট্রামের লাইন ইত্যাদি এক এবং অভিন্ন - হৃৎপিণ্ডহীন এক গণতন্ত্রের অংশ। বুক চিরলে গাড়িয়ে পড়বে মরচের গন্ধময় অদ্ভুত এক তেল, আর কিছু কাচের টুকরো, বিস্কুটের টিনের ঢাকনা কিংবা অকেজো ট্রানজিস্টারের পুরো যন্ত্রপাতি।' বলাবাহুল্য প্রিয়নাথের এই মনোভাবের মূলে আছে একযান্ত্রিক জীবন যেখানে বেঁচে থাকাটা একটা অভ্যাস মাত্র। যেখানে মধ্যতিরিশের যুবক নিজেকে ত্রমশই বৃদ্ধ মনে করতে থাকে। যেখানে প্রিয়নাথ তার অফিসের সহকর্মী মধু বিশ্বাসকে ভীড়ের মুখগুলো থেকে আলাদা করতে পারে না। তার মনে হয়, '... আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় যদি প্রত্যেকেই হয়ে পড়ে স্মৃতিভ্রষ্ট, আর মুছে যায় নাম, যদি প্রত্যেককেই নিয়ে যেতে হয় মর্গে--পোস্টমর্টেম কাউকেই আলাদা বিশেষত্ব দিতে পারবে না।' এই বিশেষত্বহীন জনসমাজের প্রধান লক্ষণ এক সার্বিক অনীহা এবং নিছক ব্যক্তিসুখের আকাঙ্ক্ষা। রাজনীতি তাদের কাছে মুহূর্তের উত্তেজনার খোরাক মাত্র। ।যুক্তফ্রন্ট জিতবে কিনা এ কৌতূহল যেমন আছে, তেমনি আছে অতি সাধারণ তুচ্ছ আশা, যুক্তফ্রন্ট সরকারে এলে নিশ্চয়ই একদিন ছুটি ঘোষিত হবে। বলাবাহুল্য নিজের বৃত্তের বাইরে যেতে না পারা এই নিতান্ত সাধারণ মানুষগুলিই মধ্যবিত্ত সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ, ব্যাপক অর্থে জনসাধারণ। এই বিশেষত্বহীন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেই আমারা পেয়ে যাই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'সরমা ও নীলকান্ত' উপন্যাসের ন ায়ককে। চাকুরিজীবী, সাধারণ সুখী মধ্যবিত্ত নীলকান্ত-র '... একটা বউ, দুটো ছেলেমেয়ে, তিনটে গাই, সতেরোটা হাঁস, একদাগেব ারো বিঘের চাষ, আটশো টাকা মাইনের পারমানেন্ট চাকরি, কলকাতার আট দশ মাইলের মধ্যে একখানা পাকাবাড়ি আর উচ্চাশা আছে।' আর সে উচ্চাশাও খুব অ-সাধারণ কিছু নয়। ভগবানকে ডেকে সে প্রায়ই মনে মনে বলে, 'একটু দেখবেন স্যার--হুট করে যেন টেঁসে না যাই। যেখানকার যা আছে তেমন থাক। তেল-নুনের দর যেন আর নালাফায়। রোদে তাতটা একটু পড়ুক। বড়লোকের া কিছুটা দয়ালু হলেই গরীবদের কষ্ট কমে যায়। আর স্যার আমি যেন বেঁচে থাকি।' আসলে নীলকান্ত এই সেফটিপিন গাঁথা নিশ্চিন্ত জীবনটুকু ষোলো আনাই চেটে চুষে খেতে চায় ।নীলকান্ত -র চাকরিটায় যেমন শ্যাওলা পড়ে গেছে তেমনি তার ভেতরেও এক পরত আবাসের ওপর নিরাপদে থাকার বাসনা ময়াম করে আগাগোড়া মাখানো হয়ে গেছে আর হয়তো তাই মিছিল দেখলে তার মনে হয় কি করে সময় নষ্ট করছে। কাগজে যুক্ত ইসতেহার, মন্ত্রীদের বিধানসভার বক্তৃতা, কাটজুরি নদীতে বন্যা সব পড়ে তার একই রকম অর্থহীন লাগে। এই নির্বিকার আত্মকেন্দ্রিকতার প্রেক্ষাপট হিসেবে আমরা অনায়াসেই চিহ্নিত করতে পারি সমসময়ের গভীর গভীরতর অসুখকে। ১৯৭৫-এ প্রকাশিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসটিকে আদ্যন্ত আচ্ছন্ন করে রাখে নান া জনের নানা ধরনের অসুস্থতা যাকে অনায়াসেই সেই অসুস্থ সময়ের প্রতীক বলে চিনে নেওয়া যায়। এক শ্বাসরোধকারী অসুস্থ পরিবেশের মধ্যে বাস করতে করতে অনিলের মনে হয় সমস্ত জীবনটাই অর্থহীন-- 'সবাই কোন না কোন চেষ্টা নিয়ে আছে। টাকা, জমি, ছেলে, মেয়ে সব বানিয়ে যাচ্ছে। বানিয়ে যাওয়ারচেষ্টায় জমে আছে।' মধ্যবয়সেই বুড়িয়ে যাওয়া অনিল হঠাৎ আবিষ্কার করে তার মায়ের একটি ডায়রি। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সেখানে তিনি লিখেছেন, ...দীর্ঘ ২৭ বছরে বহু পরিবর্তন আসিয়াছে আমার জীবনে। শুধু আমার জীবনে কেন, সমগ্র জাতির জীবনে। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে। পরাধীন ভারতর্ষই আজ স্বাধীনতা লাভ করিয় াছে--বহু দুঃখ দারিদ্র্য আশাভঙ্গের মধ্য দিয়া এই স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি। কিন্তু দারিদ্র্যে উৎসব উদ্দীপনাহীন জীবনে এই মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করিতে পারি না।
খানিকটা দূরাগত হলেও আবার মনে পড়ে যায় দুর্গাপ্রসাদের বেদনাকে, বুঝতে পারা যায় মধ্যরাত্রের অসুখী সন্তানদের যথার্থ উত্তরাধিকারকে।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত রমাপদ চৌধুরী-র ‘এখনই’ উপন্যাসটি স্বাধিনতা সমানবয়সী এই তণ প্রজন্মের এক বিরাটবিপর্যস্ত অংশের শোচনীয় দলিল। এ উপন্যাস গড়ে উঠছে অণ, টিকলু, সুজিত, ঊর্মি, ণু, বিরাম আর নন্দিনীর মতো কিছু কলেজ পড়ুয়া বা কলেজ জীবন শেষ হয়ে আসা তণ-তণীদের ঘিরে। উপন্যাসের কাহিনীতে এদেরমধ্যে কেউ কেউ তুলনামুলকভাবে প্রাধান্য পেলেও নায়ক-নায়িকা বলা যাবে না কাউকেই। এদের বুকের মধ্যে নেইপূর্বপুষের ঐতিহ্যাশ্রয়ী আত্মবিশ্বাস, সামনে নেই কোনো আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত আশ্বাস। এরা বেঁচেথাকে শুধু সমসময়ে। স্বাধীনতা-উত্তর স্বদেশে অজস্র প্রত্যাশার অপমৃত্যু, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সর্বব্যাপী বেকার সমস্যা, নবীন-প্রবীণে দুস্তর ব্যবধান, সর্বোপরি সমস্ত রকম মূল্যবোধের ক্রমিক অধোগতির মাঝখানে দাঁড়িয়েও এরা বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজতে চায়। সীমাবদ্ধ সময়ে যেখান থেকে যতটুকু পাওয়া যায়, তাতেই এদের তৃপ্তি। ধৈর্যহীন এই প্রজন্ম যা চায় তা এখনই চায়। জীবনের তাৎক্ষণিকতার প্রতিরূপ ‘এখনই’ শব্দটি তাই বারবার আবর্তিতহয় এদের স্বগত ভাবনা ও সংলাপে--‘যেখান থেকে যা পাচ্ছি, টুকরো টুকরো ভাবে পেলেই বা দোষ কি।’ টিকলু বারবার বলে, ‘...আরে বাবা লাইফটাকে একটা হায়ার পারচেজ করে নে। এখন ভোগ কর, পরে দাম দিবি। তা না,এখন চিনেবাদাম খেয়ে পেট ভরাও শালা, ফলস টিথ দিয়ে মাংস চিবোনোর আশায়।’ আবার ঊর্মির অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সংবাদে অণের মনে হয়, ‘কিন্তু ঊর্মি কি এমন ভুল করেছে? ওরা সকলেই তো জানে ওরা কিছু পাবে না, তাই সব কিছুরই টুকরো টুকরো করে স্বাদ নিতে চায়। সবটুকু, সমগ্রভাবে কখনও কোনদিন পাব এই আশায় থাকতে চায় না। অল্প হোক এখনই চাই এখনই।’ কিন্তু সত্যিই তো খণ্ড খণ্ড করে কিছু পাওয়া যায় না। টুকরো টুকরো সুখ নিয়ে বুক ভরে না আংশিকতা দিয়ে গোটা জীবনটাকে কোনদিনই ছুঁয়ে দেখা হয় না। জীবনকে অনুভব করা যায় না। নবীন প্রজন্মও যে একথা জানে না বা বোঝে না তা নয় কিন্তু সমস্ত অর্থহীনতা সত্ত্বেও তাদের বেঁচে থাকতেই হয়, সময়টাকে ভরিয়ে রাখতেই হয়। আর যেহেতু এই সময়ের হাতে কিছু নেই তাই অনিশ্চিত জেনেও ভবিষ্যতের দিকেই এদের তাকিয়ে থাকতে হয়। আসলে বড় কিছু করবার, বড় কিছু ভাববার সম্ভাবনাই নষ্ট করে দিয়েছে এই সময়। তাই উচ্চাশাহীন এই প্রজন্মকে শেষ, পর্যন্ত হয়তো টিকলুর কথাতেই সান্ত্বনা খুঁজতে হয়, ‘...আমাদের ভেতরেও বাদ আছে, কেউ শালা জ্বালিয়ে দিল না।’

কখনো কখনো অবশ্য আগুনও জ্বলে। মধ্যবিত্তেরই কেউ কেউ প্র তোলে সমাজকে নিয়ে এবং কখনো নিজেকে নিয়েও। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ (১৯৬৯) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বি. এস. সি পাশ বেকার যুবক সিদ্ধার্থ-র মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে এত অসহায় ক্রোধ ও হতাশা যার সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে চিনে নিতে পাঠকের একমুহূর্ত অসুবিধা হয় না। সিদ্ধার্থ-র প্রেক্ষণবিন্দু থেকে লেখা এই উপন্যাসে সুনীল মধ্যবিত্তের দ্বিচারিতার স্বরূপটি নগ্নভাবে উন্মোচিত করেন। পার্টি কর্মী জনৈক নরেশদা সিদ্ধার্থকে কারখানার শ্রমিকের কাজ করার পরামর্শ দিলে তার স্বভাবতই মনে হয়, ‘যে যখন চান্স পায়, অমনি একটা ফালতু লেকচার মেরে যায় ! আমি কারখানায় গিয়ে মজুর হবো, আর উনি চায়ের দোকানে বসে সিগারেট চানতে টানতে আমাকে বিপ্লব শেখাবেন।’ সিদ্ধার্থ নিশ্চিত যে সে মফস্বলের মাস্টারি করে পচে মরার জন্য জন্মায়নি। কিন্তু সেই চাকরির চেয়ে কোনোমতেই উচ্চতর নয় এমন একটি চাকরির পদপ্রার্থী হয়ে প্রায় পৌনে তিনশো জনের একজন হিসেবে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে হেনস্থা হতে হয় তাকে। সকলের হয়ে বসবার জায়গার দরবার করতে যায় সিদ্ধার্থ কিন্তু গিয়েই বুঝতে পারে, ‘সেই মুহূর্তে...সে আসলে একা। তার পিছনের দলটা ঐ ভদ্রলোককে উঠে আসতে দেখে সরে পড়েছে।’ উপন্যাসের শেষে সিদ্ধার্থ ওষুধের সেলসম্যানের চাকরি নিয়ে চলে যায় উত্তরবঙ্গে, চালায় নিরন্তর জীবনসংগ্রাম। কখনো ভাবে এ তার নির্বাসন, কখনো ভাবে ছদ্মবেশ। সমস্ত সত্তাকে সজাগ করে সে অঙ্গীকার করে, ‘হ্যাঁ, আমি ফিরে আসবো।...শুধু কেয়ার কাছেই ফিরে যাবো না, তার আগে সব প্রতিশোধ নিতেও ফিরে যাবো। ইন্টারভিউয়ের সেই লোকগুলো, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিলো, আমি ওদের সবশুদ্ধু ধবংস করে দেবো, ওই বাড়িটা পর্যন্ত ধুলোয় গুঁড়ো করে ফেলবো, বাদল আর তার দুই সঙ্গী, ওরা আমার সারা মুখ রক্তে মাখামাখি করে দিয়েছিল। আমি যদি ওদের মুখ মাটিতে ঘষে না দিই... অন্তত সান্যাল--ওর চোখ দুটো আমি উপড়ে নেবো, চেনে না আমাকে, সেই পুলিশ অফিসারটা, এমনকি কেয়ার বাবাও যদি ঘুষখোর হয়--সববাইকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রাইফেল হাতে নিয়ে... দেখে নিয়ো, ঠিক আমি ফিরো আসবো।’

সিদ্ধার্থ-র বিদ্রোহ যদি তার কল্পনায়, বিমল কর-এর ‘দংশন’ এর নায়ক কান্তির বিদ্রোহ তার ব্যক্তিজীবনের প্রত্যেকটি স্তরে, যেখানে সে তার বিত্তশালী বাবা শচীন মজুমদারের বাড়ির আরাম ও নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাস করে সরকারী নার্স মিলির প্রায় নিম্নবিত্ত ঘরে। ভদ্র মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে বিবাহ-বহির্ভূত একত্র বসবাস এবং উভয়ের মাদকাসক্তি কান্তির চরিত্রকে এক বেপরোয়া নিয়মভাঙা কালাপাহাড়ে পরিণত করে। বাবার ব্যাভিচার এবং সামাজিক অনাচার কান্তির মধ্যে জন্ম দেয় এক তীব্র ঘৃণার। সে মিলিকে অদ্ব্যর্থ ভাষাতেই বলে, ‘...আমি শচীন মজুমদারের ছেলে, ডজন ডজন ভদ্রলোক আমি দেখেছি। সে শালারা কুকুরবেড়ালের চেয়েও নোংরাভাবে জন্মেছে। ...তুমি ভদ্রলোকহয়ো না। আমিও হচ্ছি না।’ কান্তির আইনজীবী বাবা ওকালতির জোরে সমাজবিরোধীদের

বাঁচিয়ে দিলেও পুত্রেররোষ থেকে নিজে পরিত্রাণ পান না। অনাচার এবং ভণ্ডামি অত্যন্ত কাছ থেকে দেখার ফলে কান্তি হয়ে ওঠে মূর্তিমান এক বিদ্রোহ যে তার বাবাকে শ্রদ্ধা করে না তাই নয় জীবন তথা সমাজকেও ঘৃণার চোখে দেখে '...কে আছে তোমার? কী আছে তোমার? তোমার শালা জাত ধর্ম নেই, চরিত্র নেই, তোমার কাপড় সরালে দুর্গন্ধ ঘা। মাছি ভনভনকরে।' কান্তি মাঝে মাঝে ভাবে 'একটা কিছু হতে পারলে ভাল হত, 'সামর্থি' কিছু একটা, তাতে শালা বাঁচা চলত। কিন্তু কী হবে কান্তি! এই সমাজ, এই সংসার, এই জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, পাপ ধোলাইয়ের লন্ড্রিখানা--সব যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে তারপর কী থাকল ? কী যে থাকল--কী যে থাকবে কান্তি কল্পনা করতে পারে না। হয়ত কিছুই থাকবে না। বা যা থাকবে -- সেই অস্পষ্ট জগতকে সে ধারণা করতে পারছে না। না, কান্তির কোনো বিশ্বাস নেই, আশা নেই। হয়ত তাই কান্তি কিছুই করতে পারল না। হ্যাত্... বিলকুল বরবাদ হয়ে গেল জীবনটা।' আসলে হয়তো অক্ষম ক্রোধ আর অসহায় ঘৃণা ছাড়া কান্তিদের কখনোই কিছু থাকে না।

ষাটের দশক থেকে সমাজ ও রাজনীতিতে যে অনৈতিকতা মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষ করেছে তার বিদ্ধে ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিদ্ধে মধ্যবিত্তের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমরা শুনি 'বিবর', 'এখনই' এবং অবশ্যই 'দংশন'-এর মতো উপন্যাসে আর রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি ষাটের দশকের শেষে, নকশালবাড়ি আন্দোলনে। কিন্তু যে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ হল তা প্রার্থিত পরিণতি পেল না। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানানো হলেও ব্যক্তিহত্যার পন্থা, কৃষিজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের ভিত পোক্ত না হওয়া, আন্দোলনের মধ্যে সমাজ-বিরোধীদের অবাধ প্রবেশ প্রভৃতি কারণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নকশাল পন্থির আন্দোলন জনসমর্থন হারাল। একই সঙ্গে মূলত শহরকেন্দ্রিক সাংগঠনিকতার ফলে রাষ্ট্রের পক্ষেও সহজেই তাকে শনাক্ত করে দমন করা সম্ভবপর হল। ১৯৭২-এর মধ্যে এই আন্দোলন অনেকাংশে থিতিয়ে এল, পুলিশ, মিলিটারি এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নে প্রাণ হারাল অগণিত প্রতিশ্রুতিময় যুবক। হত্যা এবং প্রতিহত্যা, অগণতান্ত্রিক দমননীতি প্রভৃতি সমস্ত কারণগুলি মিলেমিশে অপমত্যু ঘটল এক রাজনৈতিক আদর্শবাদের, যে আদর্শবাদ বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে এখনও ফিরে এল না।

এভাবেই মধ্যবিত্তচেতনায় দেখা দিল কিছু সংগত প্রশ্ন। সে প্রশ্ন আন্দোলনের নীতি বা আদর্শ নিয়ে নয়, পন্থা ও নেতৃত্ব নিয়ে। সমরেশ বসু-র 'মানুষ শক্তির উৎস' (১৯৪৭) উপন্যাসটি এরকমই অজস্র প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। একদিকে যমুনা প্রশ্ন তোলে বামপন্থী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অন্যদিকে যমুনার বন্ধু তথা প্রেমিক নকশাল আন্দোলনে যুক্ত, অথচ আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে সংশয়ে ভোগা, জড়িয়ে পড়ে দলের নেতা সুবীর ও অন্যান্যদের সঙ্গে বিতর্কে, সঙ্গীদের সতর্ক করে দিতেচায় রাজনীতিতে সমাজবিরোধীদের অবাধ অনুপ্রবেশের বিষয়ে। আবার কখনো বা স্পষ্ট করেই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রয়োগ আজকের ভারতে কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তার সুনিশ্চিত মতামত জানায়---'...লেনিন তাঁর সময়ে যা বলে গেছলেন, সেই তুলনায় পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। লেনিনিজমকে কাজে লাগাতে হলে, আজকের ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে, উপযুক্তভাবে তাকে প্রয়োগ করার প্রশ্ন আছে। যে সব দেশে বিপ্লব হয়েছে, সে সব দেশের বিশেষ কোনো ফরমুলাই যে আমাদেরও কাজে লাগবে বা লাগতে হবে, আমি তা বিশ্বাস করিনা। আমাদের অবস্থা বুঝে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।' পার্টির পক্ষে সুবীর তার সমালোচনা বরদাস্ত করবে না জেনেও সে না বলে পারে না 'রিয়াল ক্লাস এনিমিদের আমরা যেমন একটু গায়ে হাতও দিতে পারিনি, তেমনি তাদের সন্ত্রস্তও করতে পারিনি। আমরা দক্ষিণপন্থীদের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছি, অবিশ্যিই না জেনে, পরোক্ষে, আর বামপন্থী সংশোধনবাদী পার্টিগুলোকে আমাদের সমালোচনার সুযোগ দিচ্ছি, কেননা, ওদের দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদের বিপরীতে আমরাও বামপন্থী সংশোধনবাদের পথে চলেছি. কিছু ইনডিভিজুয়াল ছাড়া, জনতার কোনো অংশই আমাদের সঙ্গে নেই।' বলাবাহুল্য এসব প্রশ্নের উত্তর মেলে না, সজলকে তার সংশয়ের দাম চোকাতে হয় জীবন দিয়ে আর হয়তো সেইজন্যেই উপন্যাসটির উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় সমরেশকে লিখতে হয় 'এক আবহমান প্রশ্নকে'।

'মানুষ শক্তির উৎস' উপন্যাসে বিপ্লবের পদ্ধতি নিয়ে তোলা হয়েছে কি ছু বৌদ্ধিক প্রশ্ন, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থতার কারণকে, বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে সেই যুবসমাজকে যারা একটা মতে, একটা আদর্শে প্রবল ভাবে বিশ্বাসী আবার একই সঙ্গে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতি যাদের তীব্র অনাস্থা। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এই আন্দোলনকে নৃশংসভাবে দমন করা সম্ভব হলেও জনমানস থেকে এই প্রশ্নগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা গেল না আর ওই একই প্রশ্ন সন্তানহারা মায়ের আবেগে আপ্লুত হয়ে ফিরে এল মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) উপন্যাসে। সুজাতার ছেলে ব্রতী যে তার উচচবিত্ত পরিবার, এমনকি মায়েরও অজান্তে যোগ দেয় নকশাল আন্দোলনে তারই মর্মান্তিক পরিণতির সামনে দঁড়িয়ে সুজাতার মনে হয়, 'ব্রতীর মৃত্যুর আগের প্রশ্ন হল কেন ব্রতী বিশ্বাসহীনতার ব্রতকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করেছিল।' প্রৌঢ়া সুজাতা ব্রতীর মৃত্যুর পর তাকে বোঝার চেষ্টায় তার নিম্নবিত্ত বন্ধুদের পরিবারের সংস্পর্শে আসেন তঁ

রেই মতো যারা হারিয়েছে তাদের সন্তানকে এবং একই সূত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটে ব্রতীর বান্ধবী নন্দিনীর সঙ্গে, জীবিত থাকলেও পুলিশি অত্যাচারের ফলে যে অনেকাংশে বিকলাঙ্গ। সমাজের বৃহত্তর, অংশের সঙ্গে সংযোগ ঘটার ফলে সুজাতার চোখ খুলে যার, ধরা পড়ে যায় সুখী স্বার্থান্ধ সমাজব্যবস্থা ও প্রশাসনের যথার্থ স্বরূপ---
এ সমাজে বড় বড় হত্যাকারী, যারা খাবারে -ওষুধে - শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশায় তারা বেঁচে থাকতে পারে। এ সমাজে নেতারা গ্রামের জনগণকে পুলিশের গুলির মুখে ঠেলে দিয়ে বাড়ি গাড়ি পুলিশ পাহারায় নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু ব্রতী তাদের চেয়ে বড় অপরাধী। কেননা সে এই মুনাফাখোর ব্যবসায়ীও স্বার্থান্ধ নেতাদের সমাজে বিশ্বাস হারিয়েছিল। এই বিশ্বাসহীনতা যে বালক, কিশোর বা যুবকের মনে ঢুকে যায়, তার বয়স বার-ষোল-বাইশ যাই হোক, তার শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু তার এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত মৃত্যু।... সবাই তাদের হত্যা করতে পারে। সব দলও মতের লোকেদের এই দলছাড়া হত্যা করবার নির্বাধ ও গনতান্ত্রিক অধিকার আছে। আইন-অনুমতি-বিচার লাগে না।

অপূরণীয় ব্যক্তিগত ক্ষতি ও শ্বাসরোধকারী শোকের সামনে দঁড়িয়ে সুজাতা অনুভব করেন এই সমাজব্যবস্থা, এই দলীয় রাজনীতি যুবমানসের বিদ্রোহের প্রতি কতদূর নির্বিকার, নিঃস্পৃহ ও হৃদয়হীন। যেদিন ব্রতী মারা যায় সেদিনও ....বাজারে সোনার দর চড়েছিল, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বহন করে ভারতীয় হাতির বাচচা দমদম থেকে টোকিওতে উড়ে গিয়েছিল, কলকাতায় বিদেশী ছবির উৎসব হয়েছিল, সচেতন শহর কলকাতার সচেতন ও সংগ্রামী শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা ভিয়েৎনাম বর্বরতার প্রতিবাদে আমেরিকান কনসুলেটের রেড রোডে, সুরেন ব্যানার্জি রোডের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন।
এর ঠিক একবছর তিনমাস বাদে কলকাতার লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীরা যখন বাংলাদেশের সহায় ও সমর্থনকল্পে পশ্চিমবঙ্গে তোলপাড় করে ফেলছিলেন তখন সুজাতার মনে হয়েছিল হয়তো তিনি ভুল করছেন সত্যিই যদি কলকাতায় তথা পশ্চিমবঙ্গে সেদিন নৃশংস অত্যাচার ও দমন হয়ে থাকত, ‘তা হলে ত কলকাতার কবি ও লেখকরা ওপারের পৈশাচিকতার সঙ্গে এপারের পৈশাচিকতার কথাও বলতেন? যখন তা বলেন নি, যখন কলকাতার প্রত্যহের রক্তোৎসবকে উপক্ষো করে কবি ও লেখক শুধু ওপারের মরণযজ্ঞের কথাই বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীই নির্ভুল? সুজাতার দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয় ভুল? নিশ্চয়।’ সুজাতার এই মর্মবিদারক হাহাকার আরও তীব্র হয়ে ওঠে যখন তিনি উপলব্ধি করেন সেই অস্বাভাবিক সময়ে দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিজ্ঞ, প্রশাসক এবং বুদ্ধিজীবীরা সকলেই অভিনয় করে গেছেন এক ‘অস্বাভাবিক স্বাভাবিকতার।’ এই স্বাভাবিকতা যে কি ভয়ঙ্কর, কি পাশব, কি হিংস্র তা সুজাতা মর্মে জানেন। ‘ব্রতীরা জেলে মরছে, পথে মরছে, কালো ভ্যানের তাড়া খাচ্ছে, উন্মত্ত জনতার হতো মরছে, সমস্ত জাতির যারা বিবেকস্বরূপ, তারা কেউ ব্রতীদের কথা বলছে না। সবাই এই একটি ব্যাপারে চুপ করে আছে।’ বস্তুতপক্ষে এভাবেই এক মৌনসম্মতির চক্রান্তে ক্রমশ ধবংস হয়ে যায় একটা গোটা প্রজন্ম যাদের পন্থায় ভুল থাকতে পারে কিন্তু যাদের আদর্শবাদে কোনো খাদ ছিল না। আর এই সত্য বোঝার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যান সুজাতা নিজেও স্বামী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু ও জামাতা পরিবৃত এক প্রৌঢ়া সচেতনভাবে অস্বীকার করেন পারিবারিক মূল্যবোধকে। ব্রতীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন অন্যদের থেকে। সিদ্ধান্ত নেন, ‘যেখানে ব্রতী নেই সেখানে থাকবেন না।’ মনে মনে ভাবেন ‘ব্রতী থাকতে যদি একদিনও এমনি করে মনের কথা দিব্যনাথকে বলতে পারতেন! বলে বেরিয়ে যেতে পারতেন ব্রতীকে নিয়ে!’

একটা গোটা প্রজন্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একভাবে শেষ হয়ে গেল মধ্যবিত্তের আদর্শবোধ, বদলে গেলমূল্যবোধের প্রচলিত ছক। সত্তরের উপান্তে এসে তাই আমরা দেখি সব ভুলে গিয়ে, সব ভুলিয়ে দিয়ে এক নবনির্মাণের প্রস্তুতি। যে সমাজকে ব্রতীরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, সেই সমাজ বহুজনের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে যাদের সযত্নে রাজভোগে লালন করেছে তারা ভ্রুণ থেকেই দষ্ট, দূষিত, ব্যাধিগ্রস্ত। সে সমাজে জীবনে অধিকার মৃতদের, জীবিতদের নয়। সব ধুয়ে মুছে এখন আপাতত শান্তি কল্যাণ---
এখন আর মরতে মরতে কোন কিশোর কণ্ঠ চেঁচিয়ে শ্লোগান দেয় না। আড়াই বছরের বিশঙ্খলা, যা এখানকার জীবনের সুশৃঙ্খল নিয়মকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, তার কোন চিহ্ন নেই। সুখী ও শান্তিপ্রিয় পরিবারগুলি আবার ফিরে এসেছে। এখন দেখা যায় চালের অবাধ চোরাই কারবার, অহোরাত্র সিনেমার ম্যারাপ, নররূপী দেবতার মন্দিরের সামনে মুক্তিকামী জনতার উন্মত্ত ভিড়। সেদিনের ঘাতকরা এখন আংরাখা বদল করে নতুন পরিচয়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। একটা অধ্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। দাঁড়ি। এখন মহোপন্যাসের নতুন অধ্যায় শু।

বস্তুত এমনই এক পরিবারে, যাদবপুরে নিজের চেনা কোনো এলাকায় ফিরে আসে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর ‘শ্যাওলা’ (১৯৭৭) উপন্যাসের নায়ক, পুলিশের খাতায় মৃত হিরন্ময়। কিন্তু ফিরে এলেও চারিদিকের বদলে যাওয়া অবস্থার সঙ্গে সে আর নিজেকে

মেলাতে পারে না। শারীরিক ভাবে প্রায় জরদগবে পরিণত হিরন্ময় এখন ক্রমাগত নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলে। বলাবাহুল্য তার ব্যক্তিগত সমস্যা উপন্যাসে প্রায় এক প্রতীকী তাৎপর্যে ধরা পড়ে। হিরন্ময়ের সারাদিন কাটে রাস্তায় আর সারারাত ধরে চলে এক অসম সংগ্রাম--পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চির একটা শরীরকে চার বাই পাঁচ ফুট তক্তায় ধরিয়ে নেওয়ার নিরন্তর নিষ্ফল প্রয়াস। হিরন্ময়ের সহযোদ্ধারা কেউ মৃত, কেউ জেলে আবার কেউ বা পোশাক বদলে অন্যদলে। জীবনের প্রতি আশ্চর্য নিঃস্পৃহ হিরন্ময় কোনোমতে নিৎসাহ বেঁচে থাকে। যে সমাজকে বদলানোর তাগিদে হিরন্ময়রা ব্যক্তিস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছিল, জীবন তুচ্ছ করেছিল, সেই সমাজ বা তার উপরিতল অন্তত আজ বদলে গেছে--চারিদিকে প্রাচুর্যের চিহ্ন, ভোগসর্বস্বতার অমোঘ আকর্ষণ--সেখানে হিরন্ময়দের কোনো জায়গা নেই। কলকাতায় টেলিভিশন এসেছে, ভোগপণ্য সস্তা হয়ে গেছে সবই সত্যি কিন্তু চালের দর নামে নি, প্রতি বছর দাম বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। । তাই সঙ্গতকারণেই কথক প্রশ্ন তোলেন, 'তুমি কি ভুল লড়াই লড়লে তাহলে? কাদের জন্য লড়াই? তোমার চারদিকে এত সম্পদের আয়োজন দেখে কখনো তোমার মনে হয় না যে, এদেশে সর্বহারাই মাইনরিটি?' মধ্যবিত্ত সমাজ এখন গুছিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত, কোনো গভীর চিন্তার জায়গা নেই সেখানে এমনকি যুবসমাজও আর অশান্তি চায় না। হিরন্ময়ের ছেলেবেলার বন্ধু শান্তি তার ফিরে আসায় আশঙ্কিত হয়। কখনো শাসায়, 'আমরা এ অঞ্চলে অশান্তি চাই না। এক সময়ে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে। যদি আর কিছু হয় তবে আমরা বরদাস্ত করব না।' কখনো বা লোভ দেখায় নিরাপদ আশ্রয়ের যার বিনিময়ে হিরন্ময়কে যোগ দিতে হবে তাদের গঠনমূলক যুব আন্দোলনে। কিন্তু গঠনমূলক যুব আন্দোলনের এই পৃথিবীতে হিরন্ময় বাঁচতে চায় না, দুটো শব্দই তার কাছে নির্মম পরিহাস বলে মনে হয়। উপন্যাসের শেষে পুলিশ যখন তাকে ধরতে আসে তখন সে যেন স্পষ্ট শুনতে পায় 'পুলিশের বুটের শব্দ উঠছে গঠন-মূলক, গঠন মূলক। হ্যাঁ - অবিকল ঐ রকম শব্দ। যখন হিল ফেলছে তখন শব্দ উঠছে গঠন তুলছে তখন শব্দ হচ্ছে মূলক।'

হিরন্ময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে স্বস্তি বোধ করে কিন্তু সমরেশ বসু-র 'সংকট' উপন্যাসের জহর, গোগো, কোরক,তিমির বা প্রতিমার মতো তরুণ-তরুণীরা এভাবে বাঁচতে চায় না। অথচ কিভাবে বাঁচবে তাও তাদের জানা নেই। বয়সে বড় চৈতন্যদা তাদের সমস্যা বোঝেন, বলেন, ...তোমাদের সংকট আরো গভীরতর। আসলে তোমরা কেউ জরদগব হয়ে বাঁচতে চাও না। আর কী আশা আছে তোমাদের সামনে? তোমাদের সংকট আরো গভীরতর কেন বলছি? তোমাদের ক্রীতদাস সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। কারা সেই গোলাম? যাদের স্টেটাস আছে, কম্ফর্ট আছে এমনকি লিবার্টিও আছে। তারা বুরোক্রাট টেকনোক্রাট ম্যানেজার ডিরেক্টর সেলস প্রমোটার, এরাই হচে আজকের আসল গোলাম। যদি ও এদের হাতে পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি নেই। কিন্তু আছে, কুৎসিত ভাবে আছে। জেনে রেখো, যে কোনো তন্ত্রের থেকে এই গোলামতন্ত্র সব থেকে বড়, সব দেশে এই তন্ত্রটি চালু আছে। এরাই কোটি কোটি ইয়ংদের আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখাচ্ছে যা আদ্যন্ত মিথ্যা।

ঘটনাবর্ত জটিলতর হয়ে ওঠে যখন রাজনীতির হাত ধরে দ্রুত প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলে রতন ও তার দলের (যাদের নীতি, যা দরকার আর যা খুশি তা করতেই হবে) হাতে ধর্ষিতা হয় প্রতিমা। কিন্তু ব্যক্তিগত এই সংকটের সূত্রেইপ্রতিমা বুঝে যায় লড়াইয়ের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নিছক আদর্শ আর যথেষ্ট নয়, একমাত্র পথ ক্ষমতা বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই সে বলে, 'সব প্রতিশোধের একটাই মাত্র রাস্তা আছে। ...রাজনীতিই পারে আমার সলিউশন এনে দিতে।' বলাবাহুল্য এ রাজনীতি কোনো আদর্শবাদ জারিত রাজনৈতিক চেতনা নয়, এ রাজনীতি ক্ষমতা ও ক্ষমতা প্রয়োগের স্বার্থসর্বস্ব মত্ততা মাত্র। আর রাজনীতির এই অর্থবিপর্যাসেই সম্ভবত পূর্ণ হয়ে ওঠে মোহভঙ্গের অন্তিম মণ্ডল, সত্যি হয় দুর্গাপ্রসাদের কালস্বপ্ন '...সব ছারখার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।...এতদিনের লালিত ভ্যালুজ সব পাল্টে যাবে। একটা মাতাল, করাপ্ট, ভায়োলেন্ট সোসাইটি তৈরি হবে।'